গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ২৩ সংখ্যা | ২৬ জানুয়ারি - ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

লেনিনকে শ্রদ্ধা জানাতে

উপচে পড়ল শহিদ মিনার ময়দান

শহিদ মিনার ময়দান। ২১ জানুয়ারি

মানব ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে যে স্বল্প সংখ্যক মহান চরিত্র চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, মার্ক্স-এঙ্গেলসের সুযোগ্য ছাত্র ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন তাদের অন্যতম। বলছিলেন, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। ২১ জানুয়ারি কলকাতার শহিদ মিনার ময়দান উপচে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়া লক্ষ মানুষের সমাবেশ তখন গভীর মনোযোগী। সকলেই বুঝে নিতে চাইছেন উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের তাৎপর্য।

কয়েকদিন ধরে চলছে টিপটিপ বৃষ্টি, ঠাণ্ডা হাওয়া। চাষিদের চিন্তা ফসল কতটা নষ্ট হবে তা নিয়ে। অনেকেরই ভাবনা— সমাবেশ সফল হবে তো? চারিদিকে যে উন্মাদনার পরিবেশ রামমন্দির নিয়ে তার মধ্যে মানুষ কি আসবেন? দেখা গেল আশঙ্কা একেবারেই অমূলক— সভা শুরু হয়ে গেছে, তবু মাঠে মানুষ আসার বিরাম নেই। মিছিল ঢুকেই চলেছে। কেউ এসেছেন ট্রেনে, এলাকা থেকে চাঁদা তুলে বাস, ম্যাটাডোর ভাড়া করে এসেছেন অনেকেই। আসতে যে তাঁদের হবেই! লেনিন যে জড়িয়ে আছেন মেহনতি মানুষের জীবনের প্রতিটি ছন্দে, জীবনসংগ্রামের প্রতিটি ওঠাপড়ায়। বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি মেহনতি মানুষের নিত্যদিনের জীবনযন্ত্রণা, কান্না-হাসি, তাদের চোখের জল মোছানোর কঠিন সংগ্রাম থেকে তাদের জীবনের শান্তির কোমল স্বপ্ন— এ সব কিছুর সাথে জড়িয়ে আছেন লেনিন। তাই তো তাঁকে স্মরণ করতে, শ্রদ্ধা জানাতে মাঠ জুড়ে এত মানুষের জমায়েত। এ সমাবেশ ঘোষণা করছে এক অমোঘ প্রত্যয়।

এই মহা সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন, একেবারে দিন আনা-দিন খাওয়া খেতমজুর, গ্রাম্য গৃহবধূ, ঠিকা শ্রমিক, কারখানার শ্রমিক, মোটর ভ্যান চালক, পরিচারিকার কাজ করা শ্রমজীবী মহিলা, আইসিডিএস-আশার মতো স্কিমের কর্মী থেকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, ছাত্র, চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, আইনজীবী, সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্রের অফিস কর্মচারী মধ্যবিত্ত। এই সমাবেশে আসার জন্য দলের কর্মী-সমর্থকরা বিগত কয়েক মাস ধরে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু থেকে শুরু করে একেবারে রাস্তার পথচলতি মানুষের কাছেও পৌঁছে দিয়েছেন লেনিনের কথা। তাদের থেকে তিল তিল করে সংগ্রহ করেছেন অর্থ সাহায্য। এই সমাবেশে মাখা আছে তাঁদের সকলের শ্রম, ঘাম, স্বপ্ন। লেনিনের মহান আদর্শের আকর্ষণ তো আছেই, অন্যদিকে সে ডাক পৌঁছেছে লেনিনের যথার্থ উত্তরসাধক শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া ভারতের একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর হাত ধরে। না এসে থাকা যায় কি!

মঞ্চের কাছাকাছি বাঁশের বেড়া ঘেঁষে এসে দাঁড়ালেন এক যুবক।

সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

পিঠ থেকে নামিয়ে রাখলেন তাঁর বিরাট বোঝা। কমরেড প্রভাস ঘোষ তখন বলছেন, ভোটে সরকার পরিবর্তন হয়, রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় না, তা হয় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সেই বিপ্লব করেছিলেন কমরেড লেনিন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষের উপর মানুষের শোষণ ছিল না। দারিদ্র ছিল না, ভিখারি ছিল না, পতিতাবৃত্তি ছিল না। শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহন

চারের পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় সামনে এল

ভারতে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে

ভারতের আর্থিক বৃদ্ধিকে কে-টাইপ বৃদ্ধি আখ্যা দিচ্ছেন পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরাই। ইংরেজি কে-অক্ষরের মতো এক শ্রেণির মানুষ আর্থিক বৃদ্ধির সমস্ত সুযোগকে আত্মসাৎ করে ক্রমাগত ওপরের দিকে উঠে চলেছে, আরেক শ্রেণির মানুষ আরও দারিদ্রের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ছে।

বিশ্বজুড়েই পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এই একই চিত্র। দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের যে বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি হয়ে গেল তার রিপোর্টে গোটা বিশ্বের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে এমন আশঙ্কাই উঠে এসেছে। অর্থাৎ আর্থিক বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু সেই বৃদ্ধির সুফল ভোগ করছে মুষ্টিমেয় অংশের মানুষ, ব্রাত্য থেকে যাচ্ছে সমাজের নিচের দিকের মানুষরা— যাঁরা জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর ভক্তকুল দেশের উন্নতির যত ঢাকই পেটান এই ভয়ঙ্কর বৈষম্যকে আড়াল করতে তাঁরা পারছেন না, পারছেন না সংখ্যা গরিষ্ঠের আর্থিক দুর্দশা ঢাকতে।

এক একটা সমীক্ষা আসছে, তার রিপোর্ট মার্ক্সবাদের বক্তব্যকেই সত্য প্রমাণ করে দেখাচ্ছে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পরিশ্রমের ফসল লুঠ করেই মুষ্টিমেয়র সম্পদের পাহাড় গড়ে ওঠে। তাই এই ব্যবস্থায় সব মানুষের উন্নয়নের কথা ডাহা মিথ্যা এবং প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। এ সব সমীক্ষার বিশ্লেষণ এই সত্যেই উপনীত করে যে, পুঁজিবাদ সমস্ত মানুষের উন্নয়নে ব্যর্থ। এখানেই ঘুরে ফিরে আসে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা, প্রমাণ হয় তার বিশ্বজনীন প্রাসঙ্গিকতা, যে সমাজে একজনের পরিশ্রমের ফসল আর একজন লুট করতে পারে না। শ্রমজীবী মানুষই সেখানে সমাজের সমস্ত সম্পদের মালিক। (তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা—১৮-০১-২০২৪)

প্রধানমন্ত্রীর খ্রিস্টমাস কমিটি থেকে গণপদত্যাগ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খ্রিস্টমাস সপ্তাহ পালনের জন্য একটি গ্রুপ তৈরি করেছিলেন। খ্রিস্ট ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবীণরা ছিলেন গ্রুপে। গ্রুপে রাখা হয়েছিল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে।

একজন প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে এই ধরনের অনুষ্ঠান করতেই পারেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি হন নরেন্দ্র মোদি, যিনি খ্রিস্টধর্মের উপর উগ্র হিন্দুত্ববাদী বহু আক্রমণ দেখেও রাজধর্ম পালন না করে হিমালয়ের মতো মৌন থাকেন, তাঁর উদ্যোগে খ্রিস্টমাস সপ্তাহ পালন সন্দেহ জাগায়, প্রশ্ন তোলে— হঠাৎ কেন তাঁর এই উদ্যোগ? অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ এবং ২২ জানুয়ারি তাঁর উদ্বোধন প্রস্তুতি নিয়ে যখন প্রধানমন্ত্রী এত ব্যস্ত তখন এই প্রয়াসের উদ্দেশ্যই বা কী? আগ বাড়িয়ে খ্রিস্টপ্রীতির হেতুই বা কী?

প্রশ্ন শুধু রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে উঠেছে তা নয়, এই গ্রুপের সদস্যদের মধ্যেও উঠেছে। এই প্রয়াসের মধ্যে শুভ উদ্দেশ্যের সন্ধান না পেয়ে পদত্যাগের হিড়িক পড়ে গেছে। তিন হাজারের বেশি খ্রিস্টান ব্যক্তিত্ব পদত্যাগ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান করতেই পারেন কিন্তু 'আমাদের নামে নয়'।

তাঁরা এক যৌথ প্রতিবাদপত্র লিখেছেন। সেখানে তাঁরা বলেছেন, ২০১৪ থেকে সারা দেশেই খ্রিস্টানদের উপর শাসক দলের আক্রমণ ধারাবাহিকভাবে হয়েছে। খ্রিস্টানদের স্কুল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গির্জা ধ্বংস করা হয়েছে। সাধারণ নাগরিক অধিকারগুলি থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যে ধর্মান্তরণ বিরোধী আইন করা হয়েছে, তা খ্রিস্টানদের ধর্মাচরণ, ধর্মীয় প্রচার করার মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হচ্ছে। খ্রিস্টধর্মের বহু মানুষকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়েছে। ২০২৩-এর মে থেকে মণিপুরে খ্রিস্টানদের উপর একটানা আক্রমণ চলছে। দ্ব্যর্থহীনভাবে তাঁরা বলেছেন, কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের প্রচ্ছন্ন মদত ছাড়া এ আক্রমণ ঘটতে পারে না।

তা হলে হঠাৎ কেন এই খ্রিস্টপ্রীতি? কারণ শিয়রে ভোট। মন্দির রাজনীতি, মুসলিম বিদ্বেষ আর খ্রিস্টপ্রীতির ভণ্ডামি— এই ত্র্যহস্পর্শ ভোট রাজনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কারণ দশ বছরে মোদি সরকার এমন কিছু করেনি যার দ্বারা জনগণ আনন্দে বিজেপিকে ভোট দিতে যাবে। তাই একদিকে ভোট কেনার সরকারি প্রকল্প ঘোষণা, অন্য দিকে ধর্মের নামে মেরুকরণই মোদি সরকারের নির্বাচনী কৌশল। লক্ষণীয় দিকটি হল, এই ভণ্ডামি মানুষ ধরতে পারছে। প্রধানমন্ত্রীর গড়া কমিটি থেকে তিন হাজারেরও বেশি সদস্যের পদত্যাগেই তা স্পষ্ট।

(তথ্যসূত্র ঃ দ্য টেলিগ্রাফ ০৫-০১-২০২৪)

কলকাতা বইমেলায়
গণদাবী
১৮ - ৩১ জানুয়ারি
স্টল নম্বর - ৫৩৬

দুশোটি সংগঠনের ডাকে ২২ জানুয়ারি কলকাতায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী মিছিল ও মহাসম্মেলনে অংশ নেয় এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, এআইইউটিইউসি, সিপিডিআরএস, লিগাল সার্ভিস সেন্টার সহ অন্যান্য সংগঠন। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের সভায় বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি নেতা কমরেড নন্দ পাত্র সহ অন্যরা

পাশ-ফেলহীন শিক্ষার নিদারুণ অবস্থা! প্রকাশ 'এসার রিপোর্টে'

অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অব এডুকেশন (এসার) রিপোর্ট-২০২৩ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সারা দেশের ২৬টি রাজ্যের ২৮টি গ্রামীণ জেলার ৩৪,৭৪৫ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। তাতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ছবিই ফুটে উঠেছে। সমীক্ষা দেখাচ্ছে, ১৪-১৮ বছর বয়সী ৫৬.৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ভাগ অঙ্ক করতে পারে না। এই বয়সীরা অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে। তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারে না অর্ধেকের বেশি ছাত্রছাত্রী। মাতৃভাষায় দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যবই পড়তে পারে না ২৬.৫ শতাংশ। ইংরেজি বাক্য পড়তে পারে না ৪২.৭ শতাংশ। আর যারা পড়তেও পারে, অর্থ বুঝতে পারে না তার ২৬.৫ শতাংশ।

কেন শিক্ষার এই নৈরাশ্যজনক চিত্র? শিক্ষার এই দুর্বল ভিত্তি নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আগামী সমাজ? শিক্ষার এই দুর্বল ভিত্তি দূর করার জন্য যা যা করণীয় তা করার পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী মজেছেন মন্দির নির্মাণে। অজ্ঞতার সাথে, শিক্ষার পশ্চাদপদতার সাথে অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসের মেলবন্ধনই কি চান প্রধানমন্ত্রী? তা হলে দেশ এগোবে কী করে? এসার রিপোর্ট দেখাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের ৩১.৭ শতাংশ বিজ্ঞান, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত নিয়ে পড়ে। সংখ্যাটা এক তৃতীয়াংশেরও কম। আবার শিক্ষার অতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধির জন্য এদের অনেকেই পড়া চালিয়ে যেতে পারে না। অথচ সরকার শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দ ক্রমাগত কমিয়ে চলেছে।

সারা দেশেই শিক্ষার দুর্দশাকে বাড়িয়ে তুলেছে মোদি সরকারের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতিতে পাশ-ফেল প্রথা নেই। কিছু শিখুক, না শিখুক পাশ করিয়ে দেওয়াই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতি। তারই ফল ধরা পড়েছে এসার রিপোর্টে। শিক্ষানীতির পাশাপাশি পর্যাপ্ত এবং গুণমানের শিক্ষক নিয়োগ না করাও পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তুলেছে।

শিক্ষক নিয়োগ নেই! ত্রিপুরায় ৬টি কলেজে বন্ধ হচ্ছে মাস্টার ডিগ্রি

তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সের পরিবর্তে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করেছে। কিন্তু পরিকল্পিত ও সুসংহতভাবে সেমেস্টার ভিত্তিক সিলেবাস তৈরি করা হয়নি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতি সেমেস্টারে সিলেবাসের পঠনপাঠন শেষ করা হয় না। কারণ প্রতিটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী অধ্যাপক নিয়োগের কোনও পরিকল্পনাও সরকারের নেই। তাছাড়াও ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন ধরনের ফি এমন ভাবে বৃদ্ধি করেছে যা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

এমবিবি ইউনিভার্সিটিতে বাংলা সহ, গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ের এখন পর্যন্ত কোনও শাখা খোলা হয়নি। রাজ্যের ছয়টি ডিগ্রি কলেজে মাস্টার ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়েছিল। কিন্তু অধ্যাপক ও পরিকাঠামোর অভাবে তা বন্ধ হওয়ার পথে। উচ্চ শিক্ষার এই নৈরাজ্য দূর করার দাবিতে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির ত্রিপুরা শাখার পক্ষ থেকে ছটি দাবিতে রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ডাইরেক্টরের কাছে এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ১৮ জানুয়ারি শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অসিত দাস।

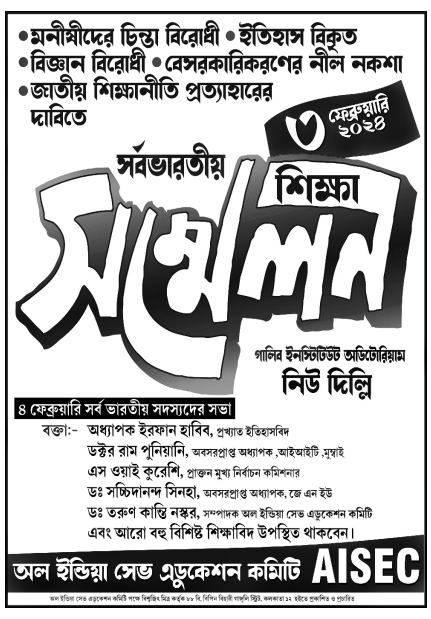

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (১৪)

ভি আই লেনিন

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ বার চতুর্দশ কিস্তি।

রাজতন্ত্রের মতো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও রাষ্ট্র আসলে এক শ্রেণি কর্তৃক অন্য শ্রেণিকে দমনের যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়

মার্ক্সের 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' বইয়ের ১৮৯১ সালের ভূমিকা

'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ'-এর তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (১৮৯১-এর ১৮ মার্চ লেখা এই ভূমিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল নিউ জেইট পত্রিকায়) এঙ্গেলস রাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, সে সম্পর্কে আলোচনায় বেশ কিছু আকর্ষণীয় মন্তব্য করেছিলেন। এরই সঙ্গে কমিউনের শিক্ষা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেছিলেন। এই সংক্ষিপ্তসার এঙ্গেলস লিখেছিলেন কমিউনের কুড়ি বছর পরে। এই সংক্ষিপ্তসার যে কতখানি গভীর, কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা তা দেখিয়েছে। জার্মানিতে যে "রাষ্ট্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস" ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল, এই সংক্ষিপ্তসারে তারই বিরোধিতা করা হয়েছে। সঠিক ভাবেই একে এখানে আলোচিত প্রশ্ন সম্পর্কে মার্ক্সবাদের শেষ কথা বলা যেতে পারে।

এঙ্গেলস দেখেছেন, ফ্রান্সে প্রতিটি বিপ্লবে শ্রমিকরা অস্ত্র ধারণ করেছে, "... তাই শ্রমিকদের নিরস্ত্র করাই ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন বুর্জোয়াদের প্রথম কাজ। এইভাবেই, প্রতিটি বিপ্লবে শ্রমিকদের সাহায্যে জয় পাওয়ার পর শুরু হত নতুন সংগ্রাম। আর সেই সংগ্রাম শেষ হত শ্রমিকদের পরাজয়ে।

বুর্জোয়া বিপ্লবের অভিজ্ঞতার এই সারসংক্ষেপ যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। সমগ্র বিষয়টির সারমর্ম এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রশ্নেরও সারমর্ম (নিপীড়িত শ্রেণির হাতে অস্ত্র আছে কি?) এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বুর্জোয়া মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত অধ্যাপকেরা ও পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা ঠিক এই মর্মবস্তুটিকে প্রায়শই উপেক্ষা করেন। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের সময় বুর্জোয়া বিপ্লবের এই গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার সম্মান (ক্যাভেইনিয়াকী সম্মান[১]) জুটেছিল মেনশেভিক, "তিনিও মার্ক্সবাদী" সেরেতেলির। ৯ জুন তাঁর 'ঐতিহাসিক' বক্তৃতায় সেরেতেলি ফাঁস করে দেন যে, বুর্জোয়ারা পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকদের নিরস্ত্র করার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবশ্য একে তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত এবং "রাষ্ট্রে"র পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত বলে চালিয়েছিলেন!

সেরেতেলির নেতৃত্বে সোসালিস্ট রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিকরা কীভাবে বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণির পক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ১৯১৭ সালের বিপ্লবের প্রত্যেক ইতিহাস-লেখকের কাছে সেরেতেলির ৯ জুনের

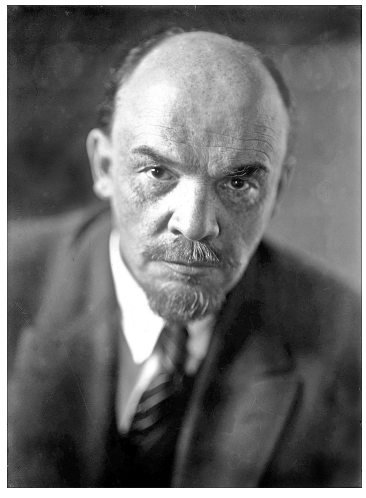

বক্তৃতা তার অন্যতম জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হিসেবে অবশ্যই পরিগণিত হবে।

রাষ্ট্র-সম্পর্কিত এঙ্গেলসের আরও একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ছিল ধর্ম নিয়ে। সবাই জানেন, জার্মান সোসাল ডেমোক্রেসি যত অধঃপতিত হয়ে আরও বেশি করে সুবিধাবাদে নিমজ্জিত হয়েছে, ততই তারা ঘন ঘন ঝুঁকেছে "ধর্ম একটি ব্যক্তিগত বিষয়"— এই বিখ্যাত সূত্রটির সঙ্কীর্ণ অপব্যাখ্যায়। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এই ব্যাখ্যাকে তারা এমন ভাবে হাজির করে, যেন বিপ্লবী সর্বহারা পার্টির কাছেও ধর্ম একটা ব্যক্তিগত বিষয়! সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী কর্মসূচির প্রতি এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধেই এঙ্গেলস তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ১৮৯১ সালে নিজের পার্টির মধ্যে এঙ্গেলস সুবিধাবাদের অতি ক্ষীণ সূত্রপাত দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাই ওই বিষয়ে তাঁর মতামত অতি সাবধানে প্রকাশ করে বলেছিলেন ঃ

"...যেহেতু প্রায় ব্যতিক্রমহীন ভাবে শ্রমিকরা কিংবা শ্রমিকদের স্বীকৃত প্রতিনিধিরাই শুধু কমিউনে আসন গ্রহণ করতেন, তাই কমিউনের সিদ্ধান্তগুলি দৃঢ়ভাবেই হত সর্বহারা চরিত্রের। প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণি শুধু মাত্র ভীরুতার কারণে যে সব সংস্কার চালু করতে পারেনি অথচ যে সংস্কারগুলি শ্রমিক শ্রেণির স্বাধীন কার্যকলাপের ভিত্তি— যেমন, রাষ্ট্রের দিক থেকে ধর্ম নিতান্তই একটি ব্যক্তিগত বিষয়— এই নীতি কার্যকর করা, কমিউন সেই সব সংস্কার প্রবর্তনের আদেশ জারি করত। অথবা তারা সরাসরি শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে আদেশ জারি করত যেগুলি অংশত সমাজের পুরনো ব্যবস্থাকে গভীরে আঘাত করে।

"রাষ্ট্র সম্পর্কে" এই কথাটায় এঙ্গেলস ইচ্ছা করেই বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল জার্মান সুবিধাবাদকে সরাসরি আঘাত করা। পার্টির প্রশ্নে ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়, এ কথা ঘোষণা করে জার্মান সুবিধাবাদ বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণির পার্টিকে 'স্বাধীন চিন্তাবিলাসী' অত্যন্ত নিম্ন স্তরের কূপমণ্ডুকতার স্তরে নামিয়ে এনেছিল, যা সাম্প্রদায়িকতা মেনে নিতে রাজি, কিন্তু জনগণের বুদ্ধি বিনাশকারী ধর্মের আফিমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে করতে রাজি নয়।

যে সব ইতিহাসবিদ ভবিষ্যতে জার্মান সোসাল ডেমোক্রেসির ইতিহাস লিখবেন, ১৯১৪ সালে তার লজ্জাজনক অধঃপতনের মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে তাঁরা দেখতে পাবেন, এই বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক উপাদানের কোনও অভাব নেই। পার্টির তাত্ত্বিক নেতা কাউটস্কির লেখাপত্রের মধ্যেকার নানা চাতুরিপূর্ণ ঘোষণা, যা সুবিধাবাদের দুয়ার হাট করে খুলে দিয়েছিল, সেগুলি থেকে শুরু করে তাঁরা পাবেন ১৯১৩ সালে 'চার্চ পরিত্যাগ কর' আন্দোলনের প্রতি পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি।

কিন্তু আসুন আমরা দেখি, কমিউনের কুড়ি বছর পরে, সংগ্রামী সর্বহারার জন্য এঙ্গেলস তাঁর শিক্ষা কী ভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছিলেন।

এই শিক্ষাগুলির প্রতি এঙ্গেলস সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ঃ "...১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন যে সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক পুলিশ এবং আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন, এটা ছিল অবিকল সেই বিগত কেন্দ্রীভূত সরকারের দমনকারী শক্তি। সেই সময় থেকে প্রতিটি নতুন সরকার এই দমনকারী শক্তিকে বাঞ্ছিত যন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। সর্বত্র ঠিক এই শক্তিরই পতন হওয়া উচিত ছিল, ইতিমধ্যেই প্যারিসে যেমন হয়েছিল।

"কমিউন প্রথম থেকেই একটা কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, একবার ক্ষমতায় আসার পর শ্রমিক শ্রেণি পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে আর কাজ চালাতে পারে না। সদ্য অর্জিত আধিপত্য আবার হারাতে না হলে শ্রমিক শ্রেণির উচিত একদিকে সমস্ত পীড়নের যন্ত্র যা আগে তার নিজের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে, তা দূর করা। এবং অন্যদিকে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সবাইকে বিনা ব্যতিক্রমে যে কোনও সময়ে পদ থেকে সরিয়ে আনা যাবে— এ কথা ঘোষণা করে তাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা ...।"

এঙ্গেলস বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, শুধু রাজতন্ত্রে নয়, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও রাষ্ট্র রাষ্ট্রই থাকে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের, 'সমাজের সেবকদের', রাষ্ট্রের যন্ত্রগুলিকে সমাজের প্রভুতে রূপান্তরিত করার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকে।

"রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের যন্ত্রগুলি সমাজের সেবক থেকে সমাজের প্রভুতে পরিণত হয়— পূর্ববর্তী সমস্ত রাষ্ট্রেই এই প্রক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এই পরিবর্তন যাতে ঘটতে না পারে সে জন্য কমিউন দুটো নির্ভুল উপায় গ্রহণ করেছিল। প্রথমত, প্রশাসন, বিচারবিভাগ ও শিক্ষা বিভাগ প্রভৃতি সমস্ত পদেই কমিউন সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত লোক নিয়োগ করেছিল। চাইলেই যে কোনও সময় প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনা যাবে, নির্বাচকদের এই অধিকার ছিল। এবং দ্বিতীয়ত, অন্যান্য শ্রমিকরা যে মজুরি পেত, ছোট বড় সমস্ত কর্মকর্তাকে সেই পরিমাণ মজুরিই দেওয়া হত। কমিউনে সর্বোচ্চ মজুরির পরিমাণ ছিল ৬ হাজার ফ্রাঁ[২]।

"এইভাবে উচ্চপদের খোঁজে থাকা ও কেরিয়ারমুখীনতার বিরুদ্ধে কার্যকরী বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ ছাড়া প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের প্রতি প্রচুর পরিমাণে বাধ্যতামূলক বিধিনিষেধ তো ছিলই...।" (ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ)

এঙ্গেলস এখানে সেই চিত্তাকর্ষক সীমারেখার কাছাকাছি পৌঁছেছেন যেখানে সুসংহত গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়, যেখানে সুসংহত গণতন্ত্র দাবি করে সমাজতন্ত্রের। কারণ, রাষ্ট্রকে অবলুপ্ত করতে হলে, রাষ্ট্রের কাজকর্মগুলিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করা ও হিসাব রাখার সহজ কাজে পরিণত করতে হবে যাতে জনসাধারণের অধিকাংশ এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই সেই কাজ করতে পারে। এবং আখের গোছানোর বিষয়টা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করতে হলে, সমস্ত সবচেয়ে স্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলোতে প্রতিনিয়ত যেমন ঘটে থাকে তেমন, অলাভজনক কিন্তু 'সম্মানজনক' সরকারি পদকে ব্যাংক বা জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির মোটা টাকার পদ দখলের সুযোগ হিসাবে যাতে ব্যবহার করা আদৌ সম্ভব না হয়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

কোনও কোনও মার্ক্সবাদী, উদাহরণস্বরূপ 'জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে'র বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে যে ভুল করেন, এঙ্গেলস কিন্তু তা করেননি। তাঁরা যুক্তি তোলেন যে, পুঁজিবাদে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাওয়া অসম্ভব এবং সমাজতন্ত্রে তা অপ্রয়োজনীয়। এই ধরনের আপাতদৃষ্টিতে সুচতুর কিন্তু আসলে ভুল উক্তি যে কোনও গণতান্ত্রিক সংস্থা সম্পর্কে, আমলাদের চলনসই বেতন সম্পর্কেও করা যায়। কারণ, পুঁজিবাদে সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস গণতন্ত্র অসম্ভব এবং সমাজতন্ত্রে সমস্ত গণতন্ত্র ক্ষয় পেতে পেতে বিলীন হয়ে যায়।

এটা একটা কূট তর্ক, সেই পুরনো মজাদার প্রশ্নটার মতো— লোকের আরও একটা চুল উঠে যাওয়া মানেই কি টাক পড়া?

গণতন্ত্রকে যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে বিকশিত করা, এই বিকাশের রূপগুলি খুঁজে পাওয়া, প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সেগুলি পরীক্ষা করা ইত্যাদি সবকিছুই হল সমাজবিপ্লবের সংগ্রামের অন্যতম মূল কাজ। আলাদা আলাদা ভাবে দেখলে, কোনও ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সমাজতন্ত্র নিয়ে আসবে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে গণতন্ত্রকে কখনওই 'আলাদা ভাবে দেখা' চলবে না, অন্যান্য বিষয়ের সাথে গণতন্ত্রকে একসঙ্গে দেখতে হবে। গণতন্ত্র অর্থনীতির উপর নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করবে, তার রূপান্তরে উদ্দীপনা জোগাবে। আবার অর্থনীতির বিকাশের দ্বারা গণতন্ত্র নিজে প্রভাবিত হবে ইত্যাদি। এই হল চলমান ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা।

এঙ্গেলস আরও বলেছেন ঃ

"পুরনো রাষ্ট্রক্ষমতার এই ধ্বংসসাধন এবং তার জায়গায় একটি নতুন ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি 'গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এর কিছু কিছু দিক নিয়ে এখানে সংক্ষেপে আরও একবার আলোচনা করা দরকার। কারণ, বিশেষ করে জার্মানিতে রাষ্ট্রের প্রতি অন্ধবিশ্বাস দর্শনের গণ্ডি ছাড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণির এবং এমনকি বহু

সাতের পাতায় দেখুন

সমাজতান্ত্রিক শিবির থাকলে প্যালেস্টাইনে এই গণহত্যা চলতে পারত না

কমসোমল বাহিনীর গার্ড অফ অনার

মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

একের পাতার পর

ছিল বিনামূল্যে। যুবক শুনছেন এক নতুন দুনিয়ার কাহিনী। বসে পড়লেন সামনের লাল কার্পেটের উপর। এ যে তাঁর নিজের জীবনের স্বপ্ন। এমন সমাজ কবে তৈরি হবে! সমাবেশে যোগ দিতে বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসেছেন পারুলরা, কেউ আশা কর্মী, কেউ আইসিডিএস কেউ বা গ্রামীণ খেতমজুর, গরিব চাষি। এসেছেন, রাজেশ রূপকরা, গ্রামীণ কর্মঠ যুবক কয়লা খাদানে, পাথর খাদানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন কাটে। তাঁরা বলছেন, আমরা গত ৫ আগস্ট স্মরণীয় ব্রিগেড সমাবেশে এসেছিলাম। দেখেছিলাম, জনসমুদ্রে দুর্যোগ হার মেনেছিল। এবারেও এসেছি, হার মেনেছে দুর্যোগ।

মঞ্চের লাল পতাকা মাথা উঁচু করে উড়ছে। মেহনতি মানুষের বিজয় ঘোষণার গর্ব তার পরতে পরতে। মাঝে ঢেউ খেলে গেছে আকাশছোঁয়া পতাকা, তার মাঝখান থেকে এগিয়ে আসছেন যেন কমরেড লেনিন।

শুরু হল সভার কাজ। পূর্ব ঘোষিত সভাপতি দলের পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য অসুস্থ, তাই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন সভাপতি এবং প্রধান বক্তা দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। লেনিন স্মরণে সঙ্গীত পরিবেশনের পর এগিয়ে এল কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমল। একদিন লেনিনই সোভিয়েত ইউনিয়নের বুকে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'কমসোমল'। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে ভারতের মাটিতে যিনি বিশেষীকৃত রূপ দিয়েছেন সেই কমরেড শিবদাস ঘোষ এ দেশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কমসোমল। কমসোমল সদস্যদের হাতে ধরা রক্তপতাকা বিপ্লবী হিসাবে গড়ে ওঠার সংগ্রামের শপথ ঘোষণা করে গেল।

প্রথমেই বক্তব্য রাখলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়সন জোসেফ। তিনি বলেন, মানবজাতির মুক্তি সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রচনা করেছেন লেনিন। বিশ্বের সমস্ত শান্তিকামী মানুষকে আজ স্বীকার করতেই হবে, সমাজতান্ত্রিক শিবির থাকলে এ ভাবে প্যালেস্টাইনের ১০ হাজার শিশু সহ ২৫ হাজারের বেশি মানুষকে খুন করতে পারত না ইজরায়েলি শাসকরা। ১১ কোটি রাষ্ট্রহীন উদ্বাস্তু দেখতে হত না এই পৃথিবীকে। এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র দুনিয়াতে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহান লেনিন। তিনি বলেন আজ বিজেপি একচেটিয়া মালিকদের কর্পোরেট কোম্পানির স্বার্থবাহী নীতি নিয়ে চলছে। বেকারত্ব এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে বহু যুবক আজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে ছুটছে। তারা মানবপাচার চক্রের শিকার হচ্ছে। তিনি বলেন, বিজেপি যেমন কর্পোরেটদের স্বার্থে মানুষের ওপর শোষণ চালাচ্ছে, একইভাবে কেরালার সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকারও আদানি-আম্বানিদের মতো একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে নানা পদক্ষেপ করছে।

পাঁচের পাতায় দেখুন

মঞ্চ থেকে সমাবেশের ছবি

তুলসীদাসও বলেননি মন্দির ভেঙে মসজিদ হয়েছিল

চারের পাতার পর

পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য স্মরণ করেন, এই শহিদ মিনার

বক্তব্য রাখছেন কমরেড সৌমেন বসু

ময়দানেই মহান লেনিনের জন্মশতবর্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি বলেন, লেনিনের নাম চেতনা জাগায়, অনুপ্রাণিত করে। বিজেপির রামমন্দির, তৃণমূলের মন্দির-গির্জা-গুরুদ্বার-মসজিদে ঘোরা, কংগ্রেসের ন্যায়যাত্রা সবই ভোটের স্বার্থে। তিনি বলেন, লেনিনের শিক্ষা ভুলে গিয়ে বামপন্থীনামধারী একদল বামপন্থার মর্যাদাকে লাঞ্ছিত করে চলেছে।

প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, প্রচলিত ধারণা ছিল ধনী-গরিবের বৈষম্য চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবে। মার্ক্স দেখালেন এই চিন্তা ভুল। একদিন সমাজে বৈষম্য ছিল না, চিরকাল তা থাকবেও না। মার্ক্সের এই চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিলেন লেনিন, রাশিয়ার বুকে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। লেনিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটা নতুন সমাজ একটা নতুন সভ্যতা। সেই সভ্যতাকে দেখেই তার রূপকার লেনিন এবং তাঁর সুযোগ্য উত্তরসাধক স্ট্যালিনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, রম্যাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ-এর মতো মনীষীরা।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, সমাজতন্ত্র দাঁড়িয়ে ছিল ৮০ বছর। এই ব্যবস্থা মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দারিদ্র, নারীর ওপর চলা নির্যাতনের অবসান ঘটিয়েছিল। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাময়িক বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে এই মহান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা অপপ্রচার চালাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে বিশ্বের মেহনতি জনগণের ওপর প্রবল অত্যাচার নামিয়ে আনছে। দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণির অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নিচ্ছে বুর্জোয়া শাসকরা। তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি চাই, লেনিন দেখিয়েছিলেন একটা সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের রাস্তা কী। লেনিনের সংগ্রামের ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এই সংগ্রাম সহজ ছিল না। একটা নতুন সভ্যতার জন্ম দিতে গিয়ে লেনিন দর্শন, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সংগঠন

বক্তব্য রাখছেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

সব দিকে মার্ক্সবাদের ভাণ্ডারে অসামান্য অবদান রেখেছেন। সংশোধনবাদ, সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লেনিনকে তীব্র লড়াই চালাতে হয়েছে। আজকের যুগটা যে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ, তা লেনিনই দেখিয়েছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদের রূপ তত্ত্বের আকারে তুলে ধরেন। এই বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদই যে যুদ্ধের জন্ম দেয় তা দেখিয়েছেন লেনিন।

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির প্রশ্নে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, বিজেপির রাজত্বে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, ধনী গরিবের বৈষম্য ভয়াবহ হারে বেড়েছে। মধ্যবিত্তরা ক্রমাগত দারিদ্রের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। আগামী নির্বাচনে বিজেপির মানুষকে নতুন কিছু বলার নেই তাই তারা কখনও পুলওয়ামার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডকে ভোটের কাজে লাগায় কখনও রামমন্দিরের হিড়িক তোলে। তিনি বলেন, ২২ তারিখ নব রামায়ণ লেখা হবে! রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কবি তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান'। অর্থাৎ কবির মনেই জন্ম রামের। বিবেকানন্দও রামকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলেননি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, বাবরি মসজিদ তৈরির সময় তুলসীদাস জীবিত ছিলেন, তিনিও রামমন্দির ভাঙার কথা লিখলেন না কেন?

কংগ্রেসের রাজনীতির প্রসঙ্গে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, কংগ্রেসও রামমন্দির নিয়ে হিড়িক তুলেছে। তারাই বাবরি মসজিদের তালা খুলেছিল। কংগ্রেসও দাঙ্গা লাগিয়েছে, ভোটের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেছে। বিজেপি কংগ্রেসের

বক্তব্য রাখছেন কমরেড জয়সন জোসেফ

রামকে হাইজ্যাক করে ভোটের প্রতিযোগিতায় এখন এগিয়ে গেছে। মানুষকে ভাবতে হবে, রাম

ছয়ের পাতায় দেখুন

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে মানুষের জীবন ছিল স্বপ্নের মতো

কোন জাদুকাঠির ছোঁয়ায় তা ঘটেছিল জানতে শহিদ মিনার ময়দানে এসেছিলেন মানুষ

কলকাতা বইমেলা চলছে বিধাননগরে। সেখানে কত মানুষের ঢল, প্রচারের জৌলুস। সেখানে না গিয়ে শহিদ মিনারে কেন? প্রশ্নটা শুনে উত্তর ২৪ পরগণার কলেজ ছাত্রী প্রত্যুষা দাস বললেন, লেনিনকে আমি জানি না। কিন্তু তাঁর শতবর্ষ পালন করতে যাঁদের দেখছি তাঁরা অন্যরকম। ছাত্র জীবনের সমস্যার সামনে পড়ে, আর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে ছাত্রদের শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিয়েছিল— এই গল্প বড়দের মুখে শুনে ভাবতাম এ কি বাস্তবে ঘটতে পারে? সেটা জানতেই এখানে এসেছি। তিনি প্রথমবার এই ধরনের সমাবেশে এসেছেন পরিবারের বাধা অতিক্রম করে।

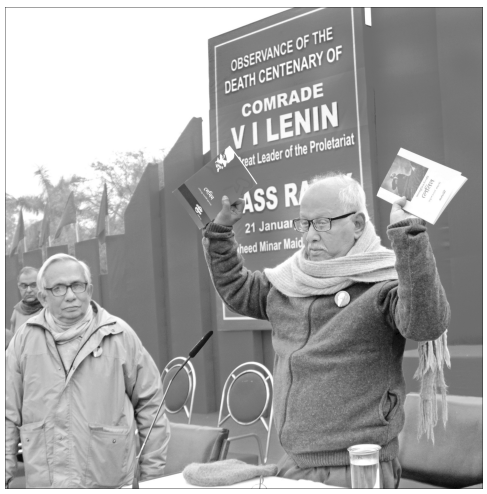

লেনিন মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 'সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ' ও 'মানবমুক্তির দিশারি লেনিন' বইদুটি কমরেড প্রভাস ঘোষের হাতে তুলে দেন কমরেড সৌমেন বসু

পূর্ব মেদিনীপুরের মুগবেড়িয়া থেকে এসেছেন রাহুল দে, চন্দন দাসেরা। খেতমজুরের কাজ করেন। বললেন, আমরা চাঁদা তুলে বাস ভাড়া করে এসেছি। চাষের কাজ চলছে, সেজন্য আরও অনেকে আসতে পারেনি। সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য শুনে বুঝে নিতে চাই রাশিয়ায় কীভাবে শ্রমিক-কৃষক-খেটে খাওয়া মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাশেই বসেছিলেন স্কুলছাত্র অশোক দিন্দা। বললেন, জাতীয় শিক্ষানীতি গরিব ঘরের ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। এটা জানার পর ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সাথে যুক্ত হই। তাদের ডাকেই এসেছি এই মহান মানুষটির সংগ্রামী জীবন নিয়ে সমাবেশে বক্তব্য শুনতে।

দার্জিলিং থেকে এসেছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের এক দল ছাত্র। জানতে এসেছেন, মহান লেনিন কী ভাবে মেকি সমাজতন্ত্রীদের মোকাবিলা করে সাধারণ মানুষের জন্য শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন এবং তা পরিচালনা করেছিলেন। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির কথা শুনেছেন। শুনেছেন অসুস্থ ও আহত ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ করে তোলার জন্য চিকিৎসা, তাদের স্যানাটোরিয়ামে রেখে সুস্থ করে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা সাংগঠনিক কাজে পাঠানোর অভিজ্ঞতা। সেই সমাজতন্ত্র সম্পর্কে জানতে এসেছি এই সমাবেশে।

মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে আসা মনে-প্রাণে বামপন্থী এক শিক্ষক রামমন্দিরের হুজুগ দেখে বিরক্ত। বললেন, মনে পড়ে যাচ্ছে কবিগুরুর 'দীনদান' কবিতাটি—

"... 'সে মন্দিরে দেব নাই' কহে সাধু।
রাজা কহে রোষে, 'দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ—শূন্য তাহা?'
'শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ'
সাধু কহে, 'আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে'।"

বললেন, ধর্ম নিয়ে রাজনীতির প্রতিবাদেই যোগ দিতে এসেছি আজকের সমাবেশে।

উপস্থিত এক সাংবাদিক ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন সমাবেশের চেহারা। শেষে বলে গেলেন, দেখলাম গ্রাম-শহর থেকে, জেলাগুলো থেকে এত মানুষ এসেছেন— শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই নয়, অসংখ্য গরিব খেটে-খাওয়া মানুষ— তবুও কী শৃঙ্খলা! কী মনোযোগ দিয়ে সকলে প্রভাসবাবুর ভাষণ শুনলেন! অন্য কোনও দলের মিটিংয়ে এমনটা চোখে পড়ে না।

এসেছেন হাওড়া জেলার এক গ্রাম পঞ্চায়েতের ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার ইউনিয়নের কর্মী সরস্বতী আস। দফতরে সারা দিন ঝাড়ু দিয়ে, টেবিল পরিষ্কার করে এবং পরিশ্রমসাধ্য আরও নানা কাজ করে মাসিক বেতন পান মাত্র ৫০০০ টাকা। বললেন, আমরা শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতির ও বেতন বাড়ানোর লড়াই করছি। নেতাদের মুখে শুনেছি, রাশিয়ার শ্রমিকরা জার ও বুর্জোয়া কেরেনেস্কি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিপ্লব করেছিল, নিজেদের জীবনকে মর্যাদাময় করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকরা কীভাবে মহান লেনিনের বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে লড়াই করত তা জানতেই এসেছি এখানে।

নদীয়ার কৃষ্ণনগর থেকে এসেছেন কৃষক নেতা পরেশ হালদার। তাঁরা লড়াই করছেন এআইকেকেএমএসের নেতৃত্বে। বললেন, আমরা কৃষক জীবনের সমস্যার সমাধানে এলাকায় এলাকায় কৃষক কমিটি গড়ে তুলে আন্দোলন আরও জোরদার করছি। রাশিয়ার বুকে বিপ্লব সফল করতে সোভিয়েতগুলোতে কৃষকরা সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশের বুকে কৃষকদের লড়াই-আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য আমরা সেখান থেকে শিক্ষা নিতে এসেছি। নদীয়া থেকেই এসেছিলেন বিশ্বনাথ মণ্ডল। তিনি প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি চালুর আন্দোলন দেখে এস ইউ সি আই (সি) দলের সংস্পর্শে আসেন। সোভিয়েত বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপনে শহিদ মিনার ময়দানে মানুষের ঢল দেখে তিনি মুগ্ধ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মহিলাদের পারিবারিক ও সামাজিক শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তির খবর শুনেছি। শুনেছি ঘরের কাজের বোঝা থেকে তাদের মুক্তি দিতে যৌথ রান্নাঘর, যৌথ ধোপাখানার কথা। আমাদের কাছে তো এ সব স্বপ্ন মনে হয়! তাই জানতে এসেছি এখানে কী ভাবে, কবে এমন দিন আনা যাবে— বললেন, পুরুলিয়ার আনাড়ার গৃহবধূ অষ্টমী পরামাণিক।

অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠার এত আয়োজন, গ্রামগঞ্জের চারিদিকে নাম-সংকীর্তনের আসর— সে সব উপেক্ষা করে প্রবল শীতের মধ্যে কেন এই সমাবেশে এলেন? দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবার জলে-জঙ্গলে কুমির-বাঘের সাথে লড়াই করে দিনকাটানো অঞ্জলি সরদার বললেন, রামমন্দির হলে কী আমাদের কাজ জুটবে? জিনিসপত্রের দাম কমে যাবে? আমাদের ঘরের মানুষগুলোকে বাঘের পেটে যেতে হবে না? তাই শোষণ-বঞ্চনা থেকে রেহাই পেতে বুঝতে এসেছি শোষিত মানুষের নেতা লেনিনের জীবনসংগ্রাম ও শিক্ষা।

পুঁজিপতি শ্রেণির সমাজতন্ত্রবিরোধী শত অপপ্রচার সত্ত্বেও শ্রমিক মেহনতি মানুষ যে আজও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন, তা আবারও প্রমাণ হল লেনিন মৃত্যুশতবর্ষের এই সমাবেশ দেখে। আমাদের দেশেও এই বিপ্লব সম্ভব একমাত্র সঠিক কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই— এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ফিরলেন শহিদ মিনারে আসা লক্ষাধিক মানুষ। কানে তখনও ভাসছে 'সর্বহারা মুক্তিসূর্য তুমি, সেলাম তোমায় কমরেড লেনিন' সঙ্গীতের সুর আর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান— মানবসভ্যতা ধ্বংসে উদ্যত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লেনিনের দেখানো পথে সর্বাত্মক সংগ্রামে শামিল হোন।

শ্রদ্ধা লেনিনকে

পাঁচের পাতার পর

নাম করলেই কি তাঁদের মূল সমস্যাগুলো মিটে যাবে? আসলে এই সব নেতারা সবাই মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, প্রতারক। ভোটের জন্য এরা সাম্প্রদায়িক মাদকতা ছড়াচ্ছে।

তিনি বলেন, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতের পরিস্থিতিকে সঠিক উপলব্ধি করে বলেছিলেন, এ দেশে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই একমাত্র শোষণমুক্তি সম্ভব। সিপিআই, সিপিএম লেনিনের এই শিক্ষাকে না বুঝে ভারতের বিপ্লবের রাস্তাকেই বুঝতে ভুল করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান তুলেছে। লেনিন দেখিয়েছেন, কমিউনিস্টরা পার্লামেন্টে যায়, নির্বাচনে যায় জনগণকে এর মোহ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। কিন্তু এ দেশে বৃহৎ বামপন্থী বলে পরিচিত সিপিআই-সিপিএম সেই শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে পার্লামেন্টারি রাজনীতিতেই ডুবে রয়েছে। কমরেড প্রভাস ঘোষ উল্লেখ করেন, লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, একটা কমিউনিস্ট পার্টি ভোটে জিতে সরকারে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলে তারা অন্য বুর্জোয়া দলের মতো সরকার চালাবে না। তাদের সরকার গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিস্থিতি তৈরি করবে। যা ১৯৬৭ এবং '৬৯-এর পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারে থাকার সময় এস ইউ সি আই (সি) করে দেখিয়েছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, সিপিআই সিপিএম দীর্ঘ দিন ধরে যে অবাম রাজনীতির চর্চা করেছে, রাজনীতিতে যুক্তিহীনতা, গায়ের জোর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তাদের ৩৪ বছরের সরকার গণআন্দোলনের কোমর ভাঙতে চেয়েছে। এই সমস্ত কার্যকলাপ বিজেপি-আরএসএস-এর জমি তৈরিতে সাহায্য করেছে। তারা এখন মার্ক্সকেও মালা দেন গান্ধীজিকেও মালা দেন। তাদের একটা সমাবেশে লাল ঝান্ডার বদলে কোন ঝান্ডা উড়েছে মানুষ দেখেছে। পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী পার্টিতে পরিণত হতে চাইছে তারা।

রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারা সিপিএমের কায়দাতেই সরকার চালাচ্ছে। তাদের একাধিক মন্ত্রী-নেতা চুরির অভিযোগে জেলে বন্দি। সিপিএম আমলে চুরি একটু আড়ালে হতো এখন একেবারে খোলাখুলি চলছে। সিপিএম যত মদের দোকান খুলেছিল, তৃণমূল তার বহু গুণ বেশি খুলছে। দোকানদার ব্যবসায়ীরা বলেন আগে একজনকে তোলা দিতে হত, এখন দশজনকে দিতে হয়। তৃণমূল একই ভাবে গণআন্দোলনের ওপর হামলা করছে। ছাত্র-যুব, সরকারি কর্মচারী সকলের ওপর আক্রমণ করছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, শাসক দলগুলো মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। তারা কিছু সামান্য সুবিধা ভিক্ষার মতো ছুঁড়ে দিয়ে মানুষের ভোট কিনতে চায়। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বিজেপির প্রতিযোগিতা লেগে গিয়েছিল কে কত টাকা সুবিধার কথা ঘোষণা করতে পারে তা নিয়ে। তৃণমূলও একই কাজ করছে। তিনি বলেন, এই সময় দরকার ছিল এবং সুযোগও ছিল বামপন্থী ঐক্য গড়ে তুলে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার। আমরাও চাই বামপন্থী ঐক্য। কিন্তু তার জন্য বামপন্থার লাইনেই তো চলতে হবে! তিনি ঘটনা তুলে দেখান কীভাবে এস ইউ আই (সি)-কে না জানিয়েই সিপিএম ৬ পার্টির ঐক্য ভেঙে দিয়েছে। চিঠির উত্তর পর্যন্ত দেয়নি। কারণ তারা কংগ্রেসের সাথে ইন্ডিয়া জোটে গিয়ে ভোটের সুবিধা খুঁজছে। কিন্তু এনডিএ এবং ইন্ডিয়া দুটোই বুর্জোয়া জোট। আমরা চাই বিজেপি হারুক। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্বে যারা ক্ষমতায় আসবে তারা নতুন কী করবে? চাই বামপন্থার ভিত্তিতে আন্দোলনের ঐক্য। তাতে জনগণ জয়ী হবে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ জনগণের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, দুটি পথ আছে— একটি ধ্বংসের, অন্যটি বাঁচার। যদি ভাবেন যা চলছে তাই চলতে থাকুক তা হলে এই দল ওই দলের পিছনে ছুটুন। না হলে এস ইউ সি আই (সি) যে রাস্তা দেখাচ্ছে তার পতাকাতলে সামিল হোন। আমরা শুধু মিটিং মিছিল করি না, চরিত্র গঠনের সংগ্রাম এই দলেই আছে। তিনি জনগণের উদ্দেশে বলেন, আপনারা এই দলকে সমর্থন করুন। আপনাদের সন্তানদের দিন, যাতে তারা এই দলের কর্মী হয়। তাতে তাদের উন্নত চরিত্র গঠিত হবে।

সভার সভাপতি কমরেড সৌমেন বসু ঘোষণা করেন, ব্যাপক বামপন্থী ঐক্য গড়ে না উঠলে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনেই প্রার্থী দেব। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের সুরের অনুরণনের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

ডিজিটাল মিডিয়াও মুঠোয় পুরতে চায় বিজেপি সরকার

ব্রডকাস্টিং বিল

বিজেপি নেতারা প্রচার করতেন ডিজিটাল দুনিয়ার প্রসার হলে একেবারে প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠও চাপা পড়ে থাকবে না, গণতন্ত্র আরও মজবুত হবে। কিন্তু সম্প্রতি পাশ হওয়া ডিজিটাল বিলে মোদি সরকার যা বলেছে তাতে সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের ব্যক্তিগত পরিসর আরও সংকুচিত হবে। জনসাধারণের বিরুদ্ধ মতপ্রকাশের কণ্ঠ আরও রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। এর ফলে গণতন্ত্র সঙ্কুচিত হতে হতে যতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাও চলে যাবে কবরে। এক কথায় এই বিল আইন হলে ডিজিটাল মিডিয়া শাসিতের উপর শাসকের নজরদারি চালানোর অস্ত্রে পরিণত হবে।

ডিজিটাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নিয়ে এসেছে ব্রডকাস্টিং সার্ভিস (রেগুলেশন) বিল। এই বিলকে কার্যত কেন্দ্রের ডিজিটাল মিডিয়ায় সংবাদ সেন্সরের হাতিয়ার বলেই মনে করছে ডিজিটাল মিডিয়া সংগঠন 'ডিজি পাব'। ৬০টি ডিজিটাল মিডিয়া সংগঠন নিয়ে গঠিত এই সংস্থা ইতিমধ্যেই এই বিল নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

এই বিলে কী রয়েছে? এতে এমন সব ধারা রয়েছে যাতে যারা সরকারে আছে তাদের বিরুদ্ধে কোনও সংবাদ বা মতামত বা সামান্য সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ হলে তা বন্ধ করার আইনি ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে। এই বিল নিয়ন্ত্রণ করবে ইন্টারনেটে প্রচারিত সবকিছুকেই— ওটিটি-র সিনেমা, ইউটিউবের ভিডিও, ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমকেও। ইতিমধ্যেই বহু সিনেমা সেন্সর বোর্ডের নির্দেশে বন্ধ করা হয়েছে বা কাটছাঁট করা হয়েছে।

দেশে এমনিতেই সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের উপর যখন-তখন হামলা চালাচ্ছে কেন্দ্রের শাসক বিজেপি সরকার। বিরোধী মতামতের জন্য নানা এজেন্সিকে ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সিল করে দিয়েছে পুলিশ-প্রশাসন। সরকারের না-পসন্দ খবর করার অপরাধে জেলে ভরা হয়েছে বহু সাংবাদিককে, এমনকি জামিন-অযোগ্য ইউএপিএ আইনের ধারা দেওয়া হয়েছে।

অবস্থা এতই গুরুতর যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ বিচারবিভাগও এ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছে। সাংবাদিকদের অকারণ হয়রানির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিচারপতিদের অনেকেই। গত এপ্রিলে বাতিল করে দেওয়া মালয়ালি চ্যানেল 'মিডিয়া ওয়াল'-এর লাইসেন্স পুনরায় চালু করে সুপ্রিম কোর্ট বলে, সরকারের সমালোচনা প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা নয়। সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে কাশ্মীরের এক সংবাদ-ওয়েবসাইটের সম্পাদককে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাঁকে জামিন দিয়ে নভেম্বরে কাশ্মীরের হাইকোর্ট বলে, কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনাকে সন্ত্রাসবাদী কাজ বলে ধরা চলে না। কিন্তু তাতেও সরকারের দমন-নীতির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। এই অবস্থায় ব্রডকাস্টিং বিল আইন হলে নামী-দামি সংবাদপত্র, চ্যানেল ছাড়াও বহু ওয়েব-পোর্টাল যারা কিছুটা হলেও স্বাধীন মতপ্রকাশ করতে পারত, তাদেরও কাজ মারাত্মক ভাবে সরকারি আক্রমণের মুখে পড়বে। ইজরায়েলের পেগাসাস স্পাইওয়ার ব্যবহার করে সাংবাদিকদের, মানবাধিকার কর্মীদের উপর বিজেপি সরকারের গোপন নজরদারি চালানোয় ইতিমধ্যেই ব্যক্তিপরিসরের গণ্ডি আরও সংকুচিত হয়েছে। এ ভাবে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নকুও লুপ্ত হতে বসেছে।

২০১৪-তে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দেখা গেছে সাংবাদিক পেশার নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে সরকারের 'জো-হুজুর'-এ পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে। না হলে প্রাণহানির শাসানি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে সাংবাদিকদের। চাপের মুখে অনেক নামী সাংবাদিক সংবাদমাধ্যমের জগৎ থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিতে বাধ্য হচ্ছেন, অনেকে মগজে কুলুপ এঁটে তোতাপাখির মতো সরকার কিংবা শাসক দলের নেতাদের বয়ান আওড়ে চলেছেন। ফলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে এক লাফে ভারত পিছিয়ে ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৬১তম স্থানে পৌঁছেছে। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক।

প্রবীণদের অনেকেরই স্মৃতিতে রয়েছে ১৯৭৫-এ ইন্দিরা গান্ধী সরকারের ইমার্জেন্সির সময়ে খবর 'সেন্সর'-এর ঘটনা। সংবাদপত্রগুলিতে কী ছাপা হবে আর কী হবে না, সেক্ষেত্রে সরকার নজরদারি চালাতো এবং সরকার-বিরোধিতার সামান্য সুর টের পেলে তৎক্ষণাৎ তা মুছে ফেলত। এখনও যেভাবে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে, তাতে কার্যত অঘোষিত জরুরি অবস্থাই চলছে। সম্প্রতি বিজেপি শাসনে আদানি ও আম্বানি গোষ্ঠী বহু সংবাদমাধ্যমের মালিকানার দখল নিয়েছে। ফলে সংবাদমাধ্যমের উপর বিজেপি-ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ বাড়ছে। তাই শোষক পুঁজিপতিদের শোষণ-বঞ্চনা এবং তাদের সেবাদাস সরকারগুলির দুর্নীতি ও জনবিরোধী কাজকর্ম নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের অধিকার হারিয়েছে সংবাদমাধ্যমগুলি।

স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারের পুঁজিপতি তোষণের নীতির ফলে নিত্যসমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষের সরকার-বিরোধী ক্ষোভকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই ফ্যাসিস্টসুলভ এই বিল নিয়ে আসছে। মরণোন্মুখ পর্যায়ে পুঁজিবাদের শেষ আশ্রয় যে ফ্যাসিবাদ— তাকেই আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেবক বিজেপি সরকার সম্প্রচার বিল এনে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনাকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। ইতিহাসের শিক্ষা— জার্মানিতে হিটলারের ফ্যাসিস্ট সরকার গণতন্ত্রকে টুঁটি টিপে মারতে চেয়েছিল, কিন্তু মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তি তা প্রবলভাবে প্রতিরোধ করেছিল। এখানেও শোষিত-নিপীড়িত মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে সঠিক নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হবে এবং এই ফ্যাসিবাদী চেষ্টাকে প্রতিহত করবে।

অযোধ্যার সত্য-মিথ্যা

কথিত আছে, রামের জন্ম অযোধ্যাতেই। ওখানেই কেটেছে তাঁর বাল্যকাল। তারপর বড় হয়েছেন, পাঠানো হয়েছে বনবাসে। ফিরে এসে ওখানেই রাজত্ব করলেন। রামের জীবনকথার এমন সব মুহূর্তগুলি স্মরণে স্থাপিত হয়েছে এক একটি মন্দির। খেলার জায়গায় গুলেলা মন্দির, লেখাপড়ার স্থানে বশিষ্ঠ মন্দির, যেখানে বসে রাজত্ব করলেন সেখানেও আছে একটি মন্দির। খাবারের জায়গাতে হল 'সীতা রসুই'। ভরতের বসার জায়গায় মন্দির, হনুমান মন্দির, কোপ ভবন, সুমিত্রা মন্দির, দশরথ ভবন— এমন বিশটি মন্দির সেখানে আছে, যাদের বয়স ৪০০ থেকে ৫০০ বছর।

কিন্তু কী আশ্চর্য! তখন ভারতে যে মুঘল সাম্রাজ্যের কাল! মুসলমান শাসকরা সাহায্য করেছিলেন মন্দির গড়তে? প্রচার তো শুনি, মন্দির ভাঙার জন্যই তাঁরা কুখ্যাত! তাদের শাসনকালে একটা গোটা শহর মন্দিরময় হয়ে গেল, আর তারা কিছু বলল না! এ কেমন শত্রুতা যে তারাই মন্দিরের জন্য জমি দিয়ে দিল! গুলেলা মন্দিরের জন্য মুসলিম শাসকদের দেওয়া জমির কথা যারা বলে তারা নির্ঘাৎ মিথ্যাবাদী! কিন্তু দিগম্বর আখড়ার ওই দলিলটা! যেখানে লেখা আছে মন্দিরের জন্য মুসলিম শাসকরা ৫০০ বিঘা জমি দিয়েছে, সেটা নিশ্চয় একেবারে ডাহা মিথ্যা! আর নির্মোহী আখড়ার জমি যে সিরাজদ্দৌলার দান— এই দলিলটাও মিথ্যা না হয়ে পারে না নিশ্চয়ই! তাহলে সত্যি বলে রইল শুধু বাবর আর তার তৈরি মসজিদ! এখন তো তুলসীদাসকেও মিথ্যা মনে হচ্ছে! তিনি তো ১৫২৮ সালের কাছাকাছি জন্মেছিলেন। বাবর ওই সময়েই রাম মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ গড়েছেন বলে প্রচার আছে। তুলসীদাস তাহলে ওই ঘটনা হয় দেখেছিলেন, না হলে শুনেছিলেন! তিনি বসে বসে তখন দোঁহা লিখছেন—'তুলসী সরনাম গুলামু হৈ রামকো, যা কো রুচে সো কহৈ অউ। মাঙ্গি কি খৈবি, মসিতকো শৈবি, লৈবোকো একু ন দৈবেকো'। 'তুলসী তো রামের প্রসিদ্ধ গোলাম। যার যা খুশি বলতে পারো, আমি ভিক্ষা করে খাব আর মসজিদে শোব। কারও সাথে আমার লেনা দেনা নেই।' তারপর লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রামায়ণ! রাম মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ গড়ছেন বাবর, আর তুলসীদাসের এতটুকু আফশোস হল না! এসব কথা কোথাও লিখেও গেলেন না! কিন্তু কেন?

অযোধ্যায় কি সত্য-মিথ্যা সব গুলিয়ে গেছে? পাঁচ পুরুষ ধরে মুসলিমরা সেখানে ফুলের চাষ করছেন। সেই ফুলই সব মন্দির আর সেখানে অধিষ্ঠিত দেবতাদের এমনকি রামের গলাতেও শোভা পায়! ওখানকার মুসলিমরা কাঠের খড়ম তৈরির পেশায় কে জানে কবে থেকে আছে! ঋষি-মুনি, সন্ন্যাসী, রামভক্ত, সবাই সেই খড়ম পরে মন্দিরে ঢোকেন। চার দশক ধরে সুন্দর ভবন মন্দিরের পুরো দায়িত্ব রইল এক মুসলমানের হাতে! ১৯৪৯ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯২ পর্যন্ত মন্দিরের ম্যানেজার ছিলেন মুন্নু মিঞা। আরতির সময় লোক কম পড়লে মুন্নু নিজেই করতাল বাজাতে দাঁড়িয়ে পড়তেন। আবার ভাবতে হচ্ছে অযোধ্যার সত্য কোনটা আর মিথ্যা কোনটা!

আটের পাতায় দেখুন

অন্য শ্রেণিকে দমনের যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়

তিনের পাতার পর

শ্রমিকেরও সাধারণ চেতনায় ছড়িয়ে গেছে। দর্শনগত ধারণা অনুযায়ী, রাষ্ট্র হল 'ভাবের বাস্তব রূপায়ণ' অথবা পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব, দার্শনিক পরিভাষায় রাষ্ট্র হল সেই ক্ষেত্র যেখানে শাশ্বত সত্য ও ন্যায় বাস্তবে রূপায়িত হয় বা হওয়া উচিত। এবং এখান থেকেই রাষ্ট্র ও তার সাথে যুক্ত সমস্ত কিছুর প্রতি এক ধরনের অন্ধ ভক্তি দেখা দেয়। এই চিন্তা আরও সহজে শিকড় গেড়ে বসে, কারণ সাধারণ মানুষ ছোট থেকে ভাবতে অভ্যস্ত যে, অতীতে যেমন হয়েছে তেমন ভাবেই রাষ্ট্র ও তার উঁচু বেতনের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ছাড়া সমাজের সাধারণ কাজকর্ম ও স্বার্থের দেখভাল করা যায় না। জনসাধারণ মনে করে, বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হওয়া থেকে মুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়ে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটা অসাধারণ সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। যদিও রাষ্ট্র আসলে এক শ্রেণি কর্তৃক অন্য শ্রেণিকে দমনের যন্ত্র ছাড়া কিছু নয় এবং রাজতন্ত্রে যেমন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও তার থেকে একটুও কম নয়। বড় জোর বলা যায়, শ্রেণি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জয়লাভ করার পর সর্বহারা শ্রেণি এই অশুভ শক্তিকে উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। ঠিক কমিউনের মতোই বিজয়ী সর্বহারা শ্রেণি অবিলম্বে তার নিকৃষ্ট দিকগুলিকে ছেঁটে ফেলতে বাধ্য হবে, যতদিন না নতুন ও মুক্ত সমাজ পরিস্থিতিতে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম রাষ্ট্রের গোটা জঞ্জালের বোঝা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে সক্ষম হবে।"

এঙ্গেলস জার্মানবাসীদের সতর্ক করে বলেছেন, রাজতন্ত্রের জায়গায় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলে তারা যেন সাধারণ ভাবে রাষ্ট্রের প্রশ্নে সমাজতন্ত্রের মূল নীতিগুলি না ভোলে। তাঁর এই সতর্কবার্তা বর্তমানে সর্বশ্রী সেরেতেলি ও চার্নভদের কাছে বক্তৃতার মতো শোনায়, যাঁরা 'কোয়ালিশন'-কৌশলে রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস ও অন্ধ শ্রদ্ধা প্রকট করে তুলেছেন!

আরও দুটি বিষয় ঃ প্রথমত, এঙ্গেলস যে বলেছেন, "রাষ্ট্র এক শ্রেণির দ্বারা অন্য শ্রেণিকে দমনের যন্ত্র" হিসাবেই থাকে এবং তা রাজতন্ত্রে যেমন, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও তার চেয়ে একটুও কম নয়, তার অর্থ মোটেই এমন নয় যে, নির্যাতনের রূপ যাই হোক না কেন, তাতে সর্বহারা শ্রেণির কিছু যায় আসে না। কোনও কোনও নৈরাজ্যবাদী অবশ্য এই কথাই শেখান। শ্রেণি সংগ্রাম ও শ্রেণি পীড়নের আরও প্রশস্ত, আরও স্বাধীন ও আরও প্রকাশ্য রূপ থাকলে তার ফলে শ্রেণি বিলোপের সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণির বিপুল সাহায্য হয়।

দ্বিতীয়ত, কেন একমাত্র নতুন প্রজন্মই পারবে রাষ্ট্রের জঞ্জালকে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলতে? এই প্রশ্ন গণতন্ত্রকে অতিক্রম করার প্রশ্নের সাথে জড়িত, যেটি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব। (চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

শ্রমিক-কৃষক থেকে বুদ্ধিজীবী
লেনিন চর্চায় শামিল সকলেই

শীতের কুয়াশা মাখা সকালে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় লাগোয়া প্রত্যন্ত গ্রাম। কান পেতে শুনছে মানুষ লেনিনের কথা। মৃত্যুশতবর্ষে দাঁড়িয়ে তাঁর

২১ জানুয়ারি স্মরণদিবসে কলকাতায় লেনিনমূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু

শিক্ষার কথা। মার্কিন কবি ল্যাংস্টন হিউজের কবিতার অনুবাদ, 'লেনিন যাবে আটকে পথে, কোথায় তেমন সীমান্ত?'

কবিতার ভাষায়, 'যাদের ভাষা যায় না বোঝা, তারাও বোঝে লেনিনকে...।' ওই প্রত্যন্ত গ্রামে বসে লিখতে ইচ্ছে করছিল, যাদের কথা কেউ শোনে না— শোনায় তারা লেনিনকে! না হলে তাঁদের ব্যথা-যন্ত্রণা দীর্ণ জীবনের কথা বলতে তাঁরা এগিয়ে এলেন কেন? লেনিনের পথ অনুসারী যে রাজনীতি তাঁদের জীবনের কথা বলে, বেঁচে থাকার দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলনের কথা বলে, লড়াইয়ের পথ দেখায় তার প্রচারকদের বুকে জড়িয়ে ধরেন কেন? বিগত কয়েকটি মাস ধরে এই বিশাল ভারতের প্রান্তে প্রান্তে নানা ভাষা, নানা জাত-ধর্ম-বর্ণে বিভক্ত মানুষের কাছে লেনিনের কথা আবারও নতুন করে যাঁরা নিয়ে গেলেন, কী বলছে তাঁদের অভিজ্ঞতা?

এস ইউ সি আই (সি) দল ডাক দিয়েছিল, বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপকার, মহান দার্শনিক ও বিপ্লবী নেতা লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষের তাৎপর্য এ দেশের নানা প্রান্তে পৌঁছে দিতে। রাজনৈতিক আলোচকদের কেউ কেউ বলেছিলেন, সামনে লোকসভা ভোট, রাজনৈতিক দলগুলো যে যার হিসাব কষতে নেমে গেছে, তথাকথিত বৃহৎ সংসদীয় বামপন্থীদেরও এই নিয়ে ব্যস্ততার শেষ নেই। আর আপনারা লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ নিয়ে ব্যস্ত! এই রাজনীতি কি মানুষ বুঝবে, গ্রহণ করবে?

দেখা গেল সন্দেহটা কত অমূলক। ভ্লাদিমির শব্দটা বানান করে পড়তেও পারবেন না হয়ত যাঁরা, দেখা গেল তাঁরাও মন দিয়ে শুনেছেন লেনিনের জীবনসংগ্রামের কথা। এ ব্যাপারে মিল আছে পুরুলিয়ার বাগমুণ্ডি কিংবা বরাবাজার, আড়শার একেবারে প্রান্তিক কৃষিজীবী, বাঁকুড়ার আইসিডিএস, আশাকর্মী, ছোট দোকানদার থেকে শুরু করে সুন্দরবনের নদীতে চিংড়ির মীন ধরে সংসার চালানো গৃহবধূ, উত্তরবঙ্গের চা বাগানের ঠিকা শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক থেকে শুরু করে একেবারে অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, সরকারি কর্মচারী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সকল শ্রমজীবী মানুষের।

এস ইউ সি আই (সি) দলের এই আহ্বান আলোড়ন তুলেছে সর্বত্র। অন্য একটি বামপন্থী দলের সমর্থক, বারুইপুরের এক শিক্ষকের আক্ষেপ, আমার দলের নেতাদের এই দিনটার কথা মনেও আছে কি না সন্দেহ। সেদিন এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে মহান লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে সেমিনারে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল নানা বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দকে। তাঁদের অনেকেই বক্তব্য রাখার পর বলে গেলেন প্রায় একই আক্ষেপের কথা।

বামপন্থী আন্দোলনের আজও পীঠস্থান এই পশ্চিমবঙ্গ। নানা সময়ে সুবিধাবাদের কানাগলিতে বামপন্থা তার মর্যাদা হারিয়েছে। এই সুবিধাবাদের একটি চরিত্র উদঘাটন করে লেনিন তুলে ধরেছেন এঙ্গেলস-এর কথা— "আশু সুবিধার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে ভুলে যাওয়া, পরবর্তীকালে ফল কী হবে তা বিবেচনায় না রেখে, ক্ষণিকের সাফল্যের জন্য চেষ্টা ও লড়াই করা, বর্তমানের জন্য ভবিষ্যতের সংগ্রামকে জলাঞ্জলি দেওয়ার সত্যিকারের অর্থ হল সুবিধাবাদের মধ্যে ডুবে যাওয়া।" 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনায় মহান লেনিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সমাজতন্ত্রের অন্যতম শিক্ষক মহান এঙ্গেলসের এই মূল্যবান শিক্ষাটিকে। আজ গভীরে গিয়ে লেনিনের শিক্ষা শুধু নয়, লেনিনের পূর্বসূরি মার্ক্স-এঙ্গেলস আর তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ, শিবদাস ঘোষের রেখে যাওয়া শিক্ষার অনুশীলন অত্যন্ত জরুরি শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে।

একদল স্বার্থান্বেষী প্রচার করে, কেন আমরা রাশিয়ার নেতা লেনিনকে স্মরণ করব? কেউ কেউ বলেন, এই সব বড় বড় চিন্তা হল পণ্ডিতদের আলোচনার বিষয়, সাধারণ মানুষ তা বুঝবেও না, তাই শুনে তাদের লাভও নেই। যদিও লেনিন মৃত্যুশতবর্ষের কর্মসূচি নিয়ে মানুষের কাছে যেতে গিয়ে অভিজ্ঞতা হল এই সব পণ্ডিতদের ঠিক বিপরীত। লেনিনের কথা যত একেবারে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেছে তত তাঁরা অনুভব করেছেন, লেনিনের চিন্তাকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার সাথে জড়িয়ে আছে শোষিত মানুষের স্বপ্ন পূরণের কথা। জড়িয়ে আছে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার বাস্তব সত্য। তাঁদের জীবনের সমস্যা, চাকরি না পাওয়া, চাষের ফসলের দাম না পাওয়া, নারীর মর্যাদাহানির সমস্যা, অভাবী সংসারের নানা সমস্যা সমাধানের রাস্তা যেমন এর মধ্যে আছে, তেমনই এতে আছে বিজ্ঞান, যুক্তি, উন্নত মন, সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথনির্দেশ।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ বিশ্বজনীন। কিন্তু তার প্রয়োগ স্থান-কাল বিচারে বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট। বর্তমান সময় ও ভারতের বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বিশেষীকৃত করে মানুষের জীবনের সমস্যার সাথে মিলিয়ে সুনির্দিষ্ট রূপে সৃজনশীল ভাবে হাজির করতে পারলে একেবারে সাধারণ মানুষও তার মর্মবস্তু ধরতে পারে সহজেই। বাস্তবে এই আদর্শকে নাড়ি দিয়ে বোঝে একমাত্র শোষিত সর্বহারা শ্রেণি। লেনিনের সুযোগ্য ছাত্র বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে ভারতে ঠিক এই কাজটাই করতে পেরেছে এসইউসিআই(সি)। তাঁর জীবনাবসানের পর তাঁর শিক্ষার আলোকে এই কাজটাও করে চলেছেন দলের পরবর্তী নেতৃত্ব।

কসবা এলাকার এক টোটো চালক, শহিদ মিনারে লেনিন মৃত্যুশতবার্ষিকীর সমাবেশে তিনি নিজে যেমন

লেনিন স্মরণে সভা ঃ দিল্লিতে এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে। ১৭ জানুয়ারি

যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তেমনই দলের কর্মীদের বলেছেন, আপনারা কিছুজন আমার গাড়িতে করে ময়দানে চলুন। তাঁর টোটো ভাড়া করেই বেশ কয়েক দিন ধরে ২১ জানুয়ারি শহিদ মিনার ময়দানে সমাবেশের প্রচার চালিয়েছেন দলের কর্মীরা। লেনিনের বিপ্লবী সংগ্রামের কথা শুনতে শুনতে তিনি ভেবেছেন, নিয়েছেন সিদ্ধান্ত।

বিগত কয়েক মাস ধরে সারা ভারত জুড়ে একটানা লেনিন চর্চার বিশেষ কর্মসূচি চালিয়ে গেছে দল। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় একেবারে স্থানীয় স্তরে সমস্ত বামপন্থী, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষকে একত্রিত করে লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ কমিটি গঠন, তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, সেমিনার, লেনিনের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, লেনিনের শিক্ষা নিয়ে একত্রিত হয়ে চর্চা এরকম নানা কিছুর আয়োজন হয়েছে। দলের কর্মীরা দেওয়াল লিখন, ব্যানার, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করেছেন। ভ্যান রিক্সা, অটো, টোটো সাজিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে চলেছে একটানা প্রচার। তাতে শামিল হয়েছেন শ্রমিক কৃষকের ঘর থেকে আসা কর্মীরা, আবার হাত লাগিয়েছেন সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসকরাও।

দলের বাইরের মানুষকে নিয়ে আঞ্চলিক স্তরে গড়ে ওঠা লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন কমিটিগুলিতে দলের বাইরের বহু বামপন্থী গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ যুক্ত হয়েছেন। কলকাতার বরানগরে এমন এক কমিটিতে শামিল একজন প্রাক্তন বিচারপতি, শিক্ষক সহ বিশিষ্টরা উদ্যোগ নিয়েছেন লেনিন চর্চার। তাঁরা প্রস্তাব দিয়েছেন, লেনিনের শিক্ষাকে শ্রমিক মহল্লায় পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি নিতে। সাধারণ মানুষকে ডাক দিয়েছেন সংগঠিত হওয়ার জন্য সঠিক আদর্শের খোঁজ করতে। বহু জেলায় এই উপলক্ষে হয়েছে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মুর্শিদাবাদের 'ঝড়' পত্রিকার উদ্যোগে বহরমপুরে হয়েছে অত্যন্ত মূল্যবান সেমিনার। এ আই ডিএসও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করেছে নানা অলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। কলকাতায় মেডিকেল ইউনিটের উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটিই উদ্যোগ নিয়েছিল লেনিনের মৃত্যু শতবর্ষ পালনের। তাদের ডাকে বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক, মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, নার্স স্বাস্থ্যকর্মী, গ্রামীণ চিকিৎসকরা সেমিনারে এসেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও দিল্লি, রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, বিহার, ঝাড়খণ্ডে নানা কর্মসূচি হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের সমস্ত রাজ্য, পূর্বের আসাম, ত্রিপুরা, ওড়িশা সহ দেশের বহু রাজ্যে সভা হয়েছে।

মহান লেনিনের এই মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপনের কর্মসূচি যে বামপন্থী আন্দোলনের একটা বৃহত্তর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়ে গেল, বামপন্থার নামে ভোটসর্বস্বতার দেউলিয়াপনাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল, সামনে এনে দিয়ে গেল এই মূল্যবান শিক্ষাকে যে, পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থায় ভোট দিয়ে শুধু সরকারেরই পরিবর্তন হয়, শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রটির পরিবর্তন হয় না। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনের দুরবস্থারও কোনও পরিবর্তন হয় না। একই সঙ্গে তা সংগ্রামী বামপন্থার পথে চলার রাস্তাতে স্থাপন করে গেল নতুন নতুন অলোকস্তম্ভ যা এই পথকে আরও উজ্জ্বল করবে, আকর্ষণ করবে সমাজের সর্বস্তরের খেটেখাওয়া মানুষকে।

অযোধ্যার সত্য-মিথ্যা

সাতের পাতার পর

অগ্রবাল মন্দিরের সমস্ত ইটে আরবিতে '৭৮৬' লেখা। এই মন্দিরের সমস্ত ইট সরবরাহ করেছিলেন, রাজা হুসেন আলি খাঁ। মন্দির নির্মাতা অগ্রবালরা পাগল, না রাজা হুসেন আলি বদখেয়ালি! কোনটা সত্য? এই মন্দিরে প্রার্থনার জন্য যে হাত ওঠে, তা হিন্দুর না মুসলমানের তা বলা মুশকিল। ৭৮৬ সংখ্যাটি থাকায় এই মন্দির সকলকে আপন করে নিয়েছিল।

তাহলে কি শুধু ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখটাই সত্য! সেই দিনটার পর সরকার বেশিরভাগ মন্দির অধিগ্রহণ করেছে। এখন সেখানে তালা, বন্ধ আরতি। লোকের আনাগোনা স্তব্ধ। বন্ধ দরজার পিছনে বসে দেব-দেবীরা বোধহয় ধিক্কার দিচ্ছেন তাদের, যারা গম্বুজে চড়ে রামের দখল নেবার চেষ্টা করেছিল! জনশূন্য হনুমান মন্দির, সীতা রসুই কি আজ ভরে থাকে রক্তের গন্ধে, যা রামের নাম করে বইয়ে দেওয়া হয়েছিল দেশজুড়ে! অযোধ্যা এমন এক শহর যা আজ শুধু এক সমস্যার নামে পর্যবসিত। অযোধ্যা আজ এক সংস্কৃতি ধ্বংসের ইতিবৃত্ত।

— সোসাল মিডিয়া থেকে পাওয়া বিবেক কুমারের হিন্দি রচনা থেকে অনূদিত।
গণদাবী ১৮ অক্টোবর, '১৯ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com